দ্য বাইবেল, দ্য কুরআন অ্যান্ড সায়েন্স

মরিস বুকাই

ভূমিকা

ওল্ড টেস্টামেন্ট, গসপেল ও কুরআনের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের মাধ্যমে মরিস বুকাই এ ধর্মগ্রন্থগুলো সম্পর্কে অনেগুলো পূর্বধারণা পরিষ্কার করেছেন। এ লেখাগুলোতে তিনি ওহীকে মানবীয় ভুল বা ব্যাখ্যা থেকে আলাদা করতে প্রয়াস চালিয়েছেন। তাঁর বিশ্লেষণের মাধ্যমে পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলো সম্পর্কে নতুন কিছু বিষয় আমরা জানতে পারি। আকর্ষণীয় এই আলোচনার শেষে তিনি বিশ্বাসী মনের সামনে একটি মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেন। একই ঈশ্বর থেকে আসা ওহীর ধারা। সময়ের সাথে সাথে যার প্রকাশভঙ্গী পাল্টেছে। এ আলোচনা থেকে আমরা কিছু বিষয় নিয়ে ভাবনার রসদ পাই। যে বিষয়গুলো ইহুদী, খৃস্টান ও মুসলামানদেরকে আধ্যাত্মিকভাবে বিভক্ত না করে বরং কাছাকাছি নিয়ে আসবে।

একজন সার্জন হিসেবে মরিস বুকাই মানুষের দেহ ও আত্মা দুটো নিয়েই অনেকসময় কাজ করেছেন। আর এভাবেই তিনি মুসলমানদের ধার্মিকতা দেখে অভিভূত হয়ে যান। ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিষয়গুলোও তাঁকে মুগ্ধ করে, যা বেশিরভাগ অমুসলিমের কাছেই এখনও অজানা। ব্যাপারগুলোর অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যা বোঝার জন্যে তিনি আরবি ভাষা শেখেন। অধ্যয়ন করেন পবিত্র কুরআন। এতে তিনি বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার উল্লেখ দেখে অবাক হলেন। বিজ্ঞানের আধুনিক জ্ঞান থাকলে কেবল এগুলোর অর্থ বোধগম্য হয়। এরপর তিনি একেশ্বেরবাদী ধর্মগুলোর পবিত্র গ্রন্থের কথাগুলোর নির্ভুলতা যাচাইয়ের দিকে মন দিলেন। সবশেষে তিনি বাইবেলের কথা ও বৈজ্ঞানিক তথ্যের তুলনা করলেন। ইহুদী-খৃষ্টান ধর্মগ্রন্থ ও কুরআন নিয়ে এ গবেষণারই ফসল এ বইটি।

সূচিপত্র

লেখকের ভূমিকা

প্রত্যেকটি একত্ববাদী ধর্মের নিজস্ব এক গুচ্ছ পবিত্র গ্রন্থ আছে। ধর্মপ্রাণ ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমানদের কাছে এই বইগুলোই বিশ্বাসের ভিত্তি। তাঁরা এগুলোকেই ঐশী বাণীর লিখিত রূপ মনে করেন। এই বাণী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ—দুইভাবেই এসেছে। ইব্রাহীম ও মুসার (আ) ক্ষেত্রে তা এসেছে আল্লাহ থেকে সরাসরি নির্দেশের মাধ্যমে। আবার ঈসা (আ) ও মুহাম্মাদের (সা) ক্ষেত্রে আল্লাহ তা পাঠিয়েছেন (মূলত) ফেরেশতা জিবরাঈলের (আ) মাধ্যমে। ঈসা (আ) অবশ্য বলতেন, তিনি আল্লাহর নামে কথা বলছেন।

ধর্মীয় ইতিহাসকে বস্তুনিষ্ঠভাবে অধ্যয়ন করলে ওল্ড টেস্টামেন্ট, গসপেল ও কুরআনকে ঐশী বাণীর লিখিত রূপ হিসেবে একই মর্যাদা দিতে হয়। নীতিগতভাবে মুসলমানরা এই মত পোষণ করেনও। তবে পাশ্চ্যাতের প্রকট ইহুদী-খৃষ্টান প্রভাবিত সমাজ কুরআনকে ঐশী গ্রন্থ বলে মেনে নিতে অস্বীকার করে।

এর জন্য আসলে এই তিন সম্প্রদায়ের একে অপরের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিই দায়ী।

ইহুদী ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ হলো হিব্রু বাইবেল। এটা খৃষ্টানদের ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে একটু আলাদা। ওল্ড টেস্তামেন্টে বাড়তি কিছু বই আছে। বাস্তব মতবাদের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য কোনো ভূমিকা রাখে না। ইহুদীরা অবশ্য তাদের পরবর্তী কোনো ঐশী বাণীর কথা স্বীকার করে না।

খৃষ্টানরা হিব্রু বাইবেল গ্রহণ করে তার সাথে আরও কিছু বাড়তি অংশ যোগ করেছে। তবে ঈসা বা যিশুর (আ) বাণীকে মানুষের কাছে প্রচার করার জন্য লিখিত প্রকাশিত সব লেখনীকে ধর্মটি গ্রহণ করেনি। ঈসার (আ) জীবন ও শিক্ষা বিষয়ক অসংখ্য বইকে গির্জা পরিবর্তন করেছে। নিউ টেস্টামেন্টের অল্প কিছু লেখাই কেবল রক্ষিত আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো চারটি ক্যানোনিক গসপেল। ঈসা (আ) ও তাঁর বার শিষ্যের পরবর্তী যুগের কোনো ওহীকে খৃষ্টানরা মেনে নেয় না। স্বাভাবিকভাবেই কুরআনকে তারা আল্লাহর কিতাব বলে মানে না।

কুরআনের এসেছে যিশুর (আ) ছয় শতাব্দী পরে। হিব্রু বাইবেল ও গসপেলের অনেক তথ্য এখানে নতুন করে এসেছে। তাওরাত১ ও গসপেলে উধ্বৃতি কুরআনে একটু পর পরই দেখা যায়। কুরআনের আগে অবতীর্ণ সব আসমানী গ্রন্থে বিশ্বাস স্থাপন করতে কুরআনেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (৪:১৩৬)। কুরআন নূহ, ইব্রাহীম, মুসা ও অন্যান্য নবীদেরকে (আ) ও তাঁদের বাণীকে গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করেছে। ঈসাকেও (আ) দেওয়া হয়েছে বিশেষ গুরুত্ব। গসপেলের মতোই কুরআনে ঈসার (আ) জন্মকে অতিপ্রাকৃত ঘটনা হিসেবে দেখানো হয়েছে। হযরত মরিয়মকেও (আ) বিশেষ সম্মান দেওয়া হয়েছে। কুরআনের ১৯ নং সুরাটির নাম দেওয়া হয়েছে তাঁরই নামে।

পাশ্চাত্যের বেশিরভাগ মানুষ এ কথাগুলো জানেই না। এতে অবাক হওয়ার তেমন কিছু নেই। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, পাশ্চাত্য বিশ্বে বহু যুগ ধরে ধর্মকে মানবতার প্রতিপক্ষ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও মানুষকে ইসলাম সম্পর্কে রাখা হয়েছে অন্ধকারে। 'মহম্মদী ধর্ম' বা 'মহম্মদী' শব্দগুলোর মাধ্যমে একটি ভুল ধারণা তৈরি করে রাখা হয়েছে। যেন ইসলামের প্রচারিত বিশ্বাসগুলো একজন মানুষ বানিয়ে নিয়েছে। আল্লাহর (খৃষ্টীয় অর্থে) কোনো ভূমিকা সেখানে নেই। এমনকি বর্তমান যুগেও এ প্রচেষ্টা ও ধারণাগুলো অক্ষুণ্ণ আছে। বর্তমানে অনেক শিক্ষিত মানুষ ইসলামের দার্শনিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকের প্রতি আগ্রহী। কিন্তু তারা ইসলামের ওহীর দিকে দৃষ্টি দেয় না। অথচ সেটাই করা উচিত ছিল।

মুসলমানদেরকে খৃষ্টানরা কী ঘৃণার চোখেই না দেখে! একবার বাইবেল ও কুরআনের কাহিনিগুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণ নিয়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন করতে গিয়ে আমার এ অভিজ্ঞতা হয়। দেখলাম, সবাই কুরআনকে উড়িয়ে দিচ্ছে। একটু সরল চিন্তা করার জন্যেও তারা কুরআনের কথাগুলো পড়ে দেখতে ইচ্ছুক নন। অবস্থা দেখে মনে হয়, কুরআন থেকে কিছু বলা মানে যেন শয়তানের দিকে ইঙ্গিত করা।

তবে খৃষ্টীয় বিশ্বের সর্বোচ্চ স্তরে সম্প্রতি একটি লক্ষ্যণীয় পরিবর্তনও চোখে পড়ছে। ভ্যাটিকানের দ্য অফিস ফর দ্য ননক্রিশ্চিয়ান অ্যাফেয়ার্স একটি নথি প্রকাশ করেছে। দ্বিতীয় ভ্যাটিকান কাউন্সিলের পর ১৯৭০ সালে এটি বের হয়। এতে বোঝা যায়, আনুষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন এসেছে। নথিতে খৃষ্টানদেরকে মুসলামানদের সম্পর্কে যুগ যুগ ধরে চলে আসা পুরাতন ও ভুল ধারণা ও অপবাদের মাধ্যমে বিকৃত মনোভাব ঠিক করতে বলা হয়েছে।